জাতীয় সংবিধান দিবস

০৪ নভেম্বর ২০২২

“বঙ্গবন্ধুর অমর অবদান বাংলাদেশের সংবিধান”

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ আয়োজনে: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

আজ ৪ নভেম্বর, জাতীয় সংবিধান দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। ১৯৭২ সালের এই দিনে গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ামক দলিল। সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তীতে ৪ নভেম্বরকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর খুব কম সময়ের মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা ও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথপরিক্রমায় সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তারই নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে (ক) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The Proclamation of Independence, 1971) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; এবং (খ) বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২ (Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972) ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ - এ দুটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি “বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২” জারি করেন। উক্ত আদেশের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের ১৬৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ জন সদস্যকে নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি “খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি” গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে “খসড়া সংবিধান” বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়। বিলটি উত্থাপনের পর বিলের উপর গণপরিষদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান’ গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের সদস্যগণ হাতে লিখিত সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষর করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

বিজয় অর্জনের এক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু দেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান উপহার দেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল। বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর সুলিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। সংবিধানের মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে আমি দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন সফল হোক - এ কামনা করি।
জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হওয়ার ৫০ বছরের ইতিহাসে এবছরই প্রথম এদিনটি জাতীয় সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়ক, সোনার বাংলার স্বপদ্রষ্টা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পারেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবলে পড়েছে। তাই দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু কাল বিলম্ব না করে বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধিকারের পক্ষে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮'র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়, সহ্য করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি শাসকগোষ্ঠীর সাথে কখনও আপস করেননি।

বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০'র সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ নির্বাচনে বাংলার জনগণ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতে এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ বিজয় মেনে নিতে পারেনি।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি রাজনৈতিক দল ও তার নেতাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া বাংলার মানুষের ম্যান্ডেটকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় পরিষদের সভা ডেকেও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির দাবি আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বাংলার মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ৭ মার্চের ভাষণের পর বাংলার সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর মুখে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

দীর্ঘ নয় মাসের দুঃসহ কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে ১১ জানুয়ারি জাতির পিতা অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এরপর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি “বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২” জারি করেন। উক্ত আদেশের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এমপিএ)-দের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয় এবং উক্ত আদেশে আরও বলা হয়, গণপরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি “খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি” গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে “খসড়া সংবিধান” বিল আকারে উত্থাপিত হলে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত বিলের উপর বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪ নভেম্বর তা গণপরিষদে গৃহীত হয়। এরপর ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে গণপরিষদের সদস্যগণ হাতে লিখিত সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষরদান করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তা কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ মাস ১৮ দিনের মাথায় দেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান উপহার দেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

জনগণের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। সে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ দিবসকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আমি ‘জাতীয় সংবিধান দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করছি এবং এ দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আনিসুল হক, এমপি

সংবিধান দিবসের তাৎপর্য

সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানে নাগরিকের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকে। মুক্তির মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লাল সবুজের পতাকা অর্জন করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। জাতির পিতা স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান আমাদের উপহার দেন। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের বৈঠকে বলেছিলেন, “শাসনতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশ- তার অর্থ হল মাঝিবিহীন নৌকা, হালবিহীন নৌকা।” এ কারণেই তিনি মানুষের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করেন।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জড়িত। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সংগ্রামসমূহ সংবিধানের স্তম্ভ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৫ সালের ৫ জুন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ণের সময় গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অধিকার নিশ্চিতের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। পাকিস্তান আমলে দীর্ঘ সময়েও সংবিধান প্রণীত না হওয়ায় বঙ্গবন্ধু তাঁর রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধানের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেন। এ সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অংশগ্রহণে বেশ কিছু বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। সেসব বৈঠকে বঙ্গবন্ধু মূল্যবান মতামত দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ক আলোচনাকে ঋদ্ধ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সংবিধান প্রণয়নের দিকে মনোযোগী হন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন তা স্পষ্ট হয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলন থেকে। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, “আমরা সাহায্য, পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জরুরি কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করার জন্য গণপরিষদের অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে প্রয়োজনের চাইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।”

সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ যাতে শুরু করা যায়, সেজন্য ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ The Constituent Assembly of Bangladesh Order, 1972 জারি করা হয়। এই আদেশের মাধ্যমে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম বৈঠক আহ্বান করা হয়। সংবিধান কীসের ভিত্তিতে প্রণীত হবে সে বিষয়ে ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, “আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তাঁরা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।”

১১ এপ্রিল ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই কমিটি বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করে। ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। গণপরিষদের সদস্যগণ সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, “যারা আজ বলেন বা চিন্তা করেন, তাদের বোঝা উচিত, এ সংবিধানের আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যারা বক্তৃতা করেন, তাদের জন্মের পূর্ব থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এর জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে।”

সুদীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান বিল গৃহীত হওয়ার দিনে গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, “এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হল। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোনো ভালো জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদদের রক্তদান সার্থক হবে।” ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

৪ নভেম্বর তারিখে মুক্তির দলিল সংবিধান গৃহীত হওয়ায় এই তারিখটি আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনটিকে জাতীয় সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। গুরুত্ব বিবেচনায় সংবিধান দিবসটিকে ‘ক’ ক্যাটাগরির জাতীয় দিবস দিবসে পালনের বিষয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠক সম্মতি প্রদান করেছে। সংবিধান প্রণয়নের ৫০ বছর পূর্তিতে ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের মহতী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি -এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের মাধ্যমে সংবিধান লংঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এবং সামরিক আইন জারি করে। সামরিক ফরমান দ্বারা পবিত্র সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। এ সকল কর্মকাণ্ড সংবিধানের প্রাধান্য ও জনগণের ক্ষমতার পরিপন্থি হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) মামলার রায়ে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ হতে ৯ এপ্রিল, ১৯৭৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সামরিক ফরমান দ্বারা সংবিধানের সকল সংশোধন অবৈধ, বাতিল ও অস্তিত্বহীন ঘোষণা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও পাসকৃত সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ মূল চেতনা অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে ফিরিয়ে এনেছেন। বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দিয়েছেন মুক্তির দলিল; তাঁর সুযোগ্য কন্যা সেই মুক্তির দলিল সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি সংবিধান দিবস পালনের বিষয়ে সক্রিয় ও আন্তরিক ভূমিকা রেখেছেন। গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনটি জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যময় বিবেচিত হওয়ায় দিনটিকে জাতীয় সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি আলোচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাবে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় সংবিধান দিবস পালনের বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবিধানের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আইনের শাসন নিশ্চিতকল্পে গুরুত্ববহ অবদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

লেখক: মোঃ গোলাম সারওয়ার, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৪ নভেম্বর। জাতীয় সংবিধান দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ বাঙালি জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে এদিনে গৃহীত হয়েছিল বাঙালি জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্ক্ষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩ আসনের পূর্ব- পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করে। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল Proclamation of Independence, 1971 ঘোষণা করা হয়; যা অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবিধান হিসেবে বিবেচিত। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 জারি করেন; যা দ্বিতীয় সংবিধান নামে খ্যাত।

একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ Constituent Assembly of Bangladesh Order, 1972 জারি করা হয়। উক্ত আদেশের অধীন ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়। ৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য প্রদানকালে জাতির পিতা বলেন, “জনাব স্পীকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে। বোধ হয় না-সত্যিই এটা প